দুর্গাপূজার একাল ও সেকাল

সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি - ঐতিহ্যের নিরবচ্ছিন্ন ফল্গুধারাটি আজও সজীব রেখেছে আমাদের ধর্ম্মীয়, সামাজিক ও লৌকিক পূজাপাঠ উৎসবকে। পূজাতত্ত্ব ও দেবীতত্ত্বের দিক দিয়ে দেবী দুর্গার আরাধনার অতল গভীরতা ও তাৎপর্য রয়েছে। সিংহবাহিনী দেবী দুর্গার দশপ্রহরণধারিনী এই রূপের পেছনেও রয়েছে আরো বহুরূপ। দেবীর রূপ - বৈচিত্রের ক্ষেত্রে মার্কণ্ডেয় পুরানের অন্তর্গত 'শ্রী শ্রী চণ্ডী'কেই তাঁর স্তবমন্ত্রে জাগরিত করেছেন দেবীকে। তাঁর স্তবে ফুটে উঠেছে দেবীর নয়টি রূপ যা নবদুর্গা নামে পরিচিত। আমাদের পুরানে বলা হয়েছে হিমালয়রাজের ঘরে যখন পার্বতী জন্মালেন তাঁর গাত্রবর্ণ কালো ছিল। গিরিরাজের আত্মীয় পরিজন তাঁকে কালী বলে ডাকতেন। দেবী ষ্ট হয়ে তপস্যার মাধ্যমে পরিবর্ত্তন করে মহাগৌরী রূপ ধারন করলেন। তাই ধ্যানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর গায়েরর রঙ পাকা ধানের মত সোনালী।

দেবীপূজার আনন্দের পিছনে রয়েছে বিষাদ, গভীর তত্ত্বের উৎসমুখে বিষাদজনিত প্রশ্নের অবস্থিতি। সমাধি বৈশ্য ও রাজা সুরথ উভয়ের আত্মীয় স্বজনের কাছে পরিত্যক্ত হয়েছেন। দুঃখে বিষাদে বিবাগী হয়ে ঘুরতে ঘুরতেমেধা ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করলেন তাঁরা। মেধা ঋষি শোনালেন সে মহাশক্তির কথা, যে শক্তি বিশ্বে সংসারের নিয়ন্তা। ঋষির আদেশে তাঁরা দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্মান করে দেবীপূজার সূচনা করলেন। মার্কণ্ডেয় পুরানের শ্রী শ্রী চণ্ডীতে দেবীর মূল তিনটি রূপেই দেখা পাই। এঁরা হলেন মহাকালী, মহালক্ষী ও মহাসরস্বতী। অবশ্য আজকের পূজিতদেবীর মূর্তির সঙ্গে ওই শ্রী শ্রী চন্ডী বর্ণিত মূর্তির অনেক তফাৎ।

সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই ভারতে শক্তির আরাধনা চলে এসেছে। ঋগ্বেদ এবং দেবী ভাগবতে দেবীকে জ্বলন্ত অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এখানে দেবী যজ্ঞাগ্নির প্রতীকী রূপা। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাযান সম্প্রদায় বোধিসত্ত্ব মূর্তির সঙ্গে দেবীমূর্তির উপাসনা শু করেন। বোধিসত্ত্বের সঙ্গিনীরূপে তারামূর্তি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। এএই তারামূর্ত্তির সঙ্গীরূপে মারীচি এবং ময়ুরবাহনা মহাময়ূরীকে দেখা যায়। ঠিক এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুত্থান হয়। বোধিসত্ত্বের পরিবর্তে নারায়ণের পাশে শ্রী ও ভবানী নামে দুটি দেবী বিরাজিত হন। বৌদ্ধগুহা ইলোরায় অষ্টসখী সহ পার্বতী মূর্ত্তির দেখা মেলে।

একাদশ শতাব্দীতে সম্ভবত সেন বংশের লক্ষণ সেনের সময় বাংলার দেবীমূর্ত্তির সঙ্গে লক্ষী ও সরস্বতী যুক্তহয়। ঐ সেই মারীচি দেবী থেকে লক্ষ্মী আর ময়ূরবাহন থেকে সৃষ্টি হয় সরস্বতী। বৌদ্ধ দেবতা হয়গ্রীব, যাঁর অর্ধেক দেহ অশ্ব এবং অর্ধ মানবাকার, তাই থেকে আকারিত হল হস্তীমুখ গনেশের। বৈষ্ণবরা প্রথমে বুদ্ধকে দশাবতারের মধ্যে এনে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে একটি সংযুক্তি চাইলেন আর দেবী তার হলেন দশমহাবিদ্যার এক দেবী। এই সেন বংশের রাজত্বকালেই বাংলার সমাজ - সংস্কৃতিতে এক বিরাট পরিবর্ত্তন এল। শ্রী শ্রী চন্ডীর কঠোর রণচন্ডী দেবী হয়ে উঠলেন বাংলার শ্যামল পেলব ঘরের মেয়ে।

আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে সৃষ্ট মহাভারতে ভীষ্মপর্বের ২৩তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভের জন্য দেবী দুর্গার পূজা করার উপদেশ দেন। কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়নে রাম এবং রাবন উভয়কেই দেবীদুর্গার ভক্ত বলে বর্ণিত আছে। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বিখ্যাত বাঙ্গালী স্মৃতি - নিবন্ধকার রঘুনন্দন পঞ্চদশ শতকে জন্মান। রঘুনন্দনের (১৫০০ - ১৫৭৫) "তিথিতত্ত্ব" গ্রন্থে দুর্গোৎসব তত্ত্ব বর্নিত আছে। মিথিলার স্মার্ত পন্ডিত বাচস্পতি মিশ্র (১৪২৫ - ১৪৮০) তাঁর 'ত্রিয়াচিন্তামনি" ও "বাসন্তি পূজা প্রকরণ" গ্রন্থে দেবীর মাটির প্রতিমার কথা উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতি (১৩৭৫-১৪৫০) তাঁর "দুর্গোৎসব নির্নয়" গ্রন্থে মাটির প্রতিমায় দুর্গাপূজার উল্লেখ করেছেন।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে মনুসংহিতার টিকাকার কুল্লুকভট্টের পুত্র পূর্ববঙ্গের রাজসাহী জেলার তাহেরপুর গ্রামে দুর্গাপুজা অনুষ্ঠান করেন। পুত্রের নাম কংসনারায়ন চৌধুরী যিনি তৎকালীন প্রায় ৯ লক্ষটাকা ব্যয়ে এই পূজা করেন। তিনি ছিলেন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্যাশিয়ার। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে জমিদার সার্বর্ণ রায়চৌধুরীর বংশধরেরা প্রথম কলকাতার বরিষায় দুর্গাপূজা করেন। আবার কংসনারায়ণের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ভাদুড়িয়ার রাজা জগৎ নারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিজের বাসন্তী পূজা করেছিলেন। প্রায় এই সময়ে হুগলীর বৈঁচি গ্রামের ধনবান গঙ্গাধর কুমার পাঁচশ ভরি সোনা দিয়ে তৈরী দুর্গা প্রতিমা পূজা করে ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ মহকুমার ইছাপুর গ্রামের জমিদার রাঘব চক্রবর্তী চৌধুরী ইছাপুরে দুর্গোৎসব করেন।

এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের প্রতি অনুগত হঠাৎ বড়লোক বনে যাওয়া কলকাতার ধনিক শ্রেনীর অনেকেই দুর্গাপূজার উৎসবকে সাহেবদের অনুগ্রহ লাভের মাধ্যম করে তোলেন। তার জন্য শাস্ত্রীয় বিধি ভেঙে চোখধাঁধানো, মনমাতানো যাবতীয় আয়োজন ও ব্যবস্থার ঘাটতি ছিল না। দেশীয় ঢাক - ঢোল - কাঁসরের সঙ্গে বিলিতি ব্যান্ড, অঢেল আলোকসজ্জা, আতসবাজী পোড়ানো, অফুরন্ত পান - ভোজন, বাইজীনাচ, হাফ - আখড়াই, খেমটানাচ মিলে মিশে একাকার হতো। এটা পরিবারের সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা রক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পূজার নামে এই সব কর্মকান্ডে যাঁরা কলকাতায় বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজা নবকৃষ্ণ দেব, প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, কেষ্টচাঁদ মিত্র বারানসী ঘোষ, রামদুলাল দে সরকার (ছাতুবাবু, লাটুবাবু খ্যাত), দর্পনারায়নঠাকুর, রামচাঁদ রায়, গোকুলচন্দ্র ঘোষাল, রাজা সুকুমায় রায় প্রভৃতি।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রী মা সারদাকে বলতেন 'জ্যান্ত দুর্গা'। স্বামীজির উদ্যোগেই বেলুড়মঠ ও মিশনে দুর্গাপূজা শু হল ১৯০১ সালের ১৯ শে অক্টোবর। স্বামীজির নির্দেশে বালী ও উত্তরপাড়ার বহু ব্রাহ্মনবংশজাতদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই প্রথম পূজার পুরোহিত ছিলেন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল, তন্ত্রধারক ছিলেন পাইকপাড়ার মহারাজ ইন্দ্রনারায়ণ সিংহের সভাপন্ডিত বিখ্যাত তন্ত্রসাধক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। সেই ঐতিহাসিক পূজায় উপস্থিত ছিলেন সারদা মা ছাড়াও গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীম, মায়ের তিন সহচরী গোলাপমা, গৌরীমা ও যোগীনমা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ।

দুর্গাপূজায় কুমারীপূজা শু হয় ১৯০৩ সাল থেকে। সাধারণত অষ্টমী ও নবমীর দিন কুমারী পূজা হয়। যে সমস্ত বাড়ীতে কুমারী পূজা হয় তাদের মধ্যে অন্যতমঃ

১. হাওড়ার শিবপুরে বি, কে, পালর বাড়ীর পুজো। ৩০০ বছর পুরোনো। এখানে দুর্গা দ্বিভুজা।
২. বরানগরের বংশীধর দত্তের পূজা। দ'শ বছরের পুরানো পুজো।
৩. পটলডাঙার বসুমল্লিক বাড়ীতে রাধানাথ মল্লিক প্রবর্তিত পুজো। পুজোর বয়স ১৭৫ বছর।
৪. কৃষ্ণনগরের নায়েক বাড়ীর ১৫০ বছরের প্রাচীন পুজো।
৫. উত্তর কলকাতায় জোড়াসাঁকো অঞ্চলের নরসিংহ চন্দ্র দাঁ-র বাড়ীর ১৭০ বছরের পুজো।
৬. শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেবের বাড়ীর পুজো। এই পুজো শু হয় পলাশীর যুদ্ধের বছরে, ১৭৫১ সালে।

সেকাল এবং একালের দুর্গাপুজার এক বড় বৈচিত্র্য হল বারোয়ারী বা সর্বজনীন পূজা। কলকাতায় সর্বজনীন দুর্গাপূজার শু হয় অনেক পরে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে হুগলী জেলার গুপ্তি পাড়াতে বারোজন ইয়ার বাবন্ধুতে মিলে বাড়ীর দুর্গাদালানের পূজা বাইরে করেন। সেটা ছিল জগদ্ধাত্রি পূজা। সেই থেকে কলকাত ার বারোয়ারী পূজা শু হয়। কলকাতার সর্বজনীন দুর্গাপূজাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম কোনটি তাই নিয়ে মতভেদ আছে। প্রধান মত হল ভবানীপুরের সনাতন ধর্ম্মোৎসা হিনী সভার পুজা, সিকদারবাগান সর্বজনীন পুজা, শ্যামপুকুর সর্বজনীন পূজা। বাগবাজার সর্বজনীন পূজা, সিমলা ব্যায়াম সমিতির পূজোগুলিই প্রথম দিকের পূজ া। আর একটি মত হল আজ থেকে ৭৩ বছর আগে ১৯২৬ সালে বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু কলকাতায় প্রথম সর্বজনীনপূজার প্রতিষ্ঠা করেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে শুর করে চল্লিশের দশক পর্য্যন্ত বহু সর্বজনীন দুর্গাপূজা কালীপূজা তথা দেবীপূজাশু হয়েছিল। এর প্রধান কারন ছিল স্বদেশী আন্দোলন বিপ্লবী আন্দে ালন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি ও ব্যাপক প্রভাব। পূজার বোধন থেকে নবমী পর্যন্ত বন্দেমাতরম গান চণ্ডীপাঠ, শারীরিকক্রিয়া-কৌশল প্রদর্শন, বিশেষ করে মহাষ্টমীর দিন লাঠি খেলা, ছুরি খেলা, সংঘ ব্যায়ামের প্রদর্শন সর্বজনীন পূজামন্ডপের এক বিশেষ অঙ্গ ছিল। এছাড়া দরিদ্রনারায়ণ সেবা, বস্ত্র বিতরণ, অন্যান্য সমাজ কল্যাণমূলক কার্য্যসূচী এইসর্বজনীন পূজার উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য ছিল।
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নবজাগৃতিতে উত্তরপাড়ার একটি বিশেষ অংশ ছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে এখানেও বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের যুগান্তকারী ক াজকর্ম ঐতিহাসিক মাত্রা পেয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তরপাড়ার প্রতিষ্ঠাতা রত্নের রায়চৌধুরী বংশের জামাতা রামনিধি চট্টোপাধ্যায় উত্তরপাড়ায় দুগ র্গাপূজা অনুষ্ঠান কনের। তখন কার স্থানিয় সমাজ জীবনে এই পূজার বিশিষ্ট স্থান ছিল। আজও এই পূজা নিষ্ঠা সহকারে চাটুজ্জে বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর পাড়ায় প্রথম সর্বজনীন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয় সারস্বত সম্মিলন পাঠাগারে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে। আজ শতবর্ষের দোরগোড়ায় এই পূজা 'রামঘাট সার্বজনীন দুর্গোৎসব' নামে চলে আসছে। এছাড়া বর্তমানে প্রায়২০০টি সর্বজনীন পূজা উত্তরপাড়া ও আশেপাশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
শারদীয়া দুর্গাপূজা আজ শুধু বাঙ্গালীর ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান নয়, আজ এই পূজা ভারতের এক সুবৃহৎ জাতীয় উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে চালিত হয় বিশাল শিল্প - বাণিজ্য বাজার। কলকাতায় প্রায় ১৫০০ প্রতিমা পূজিতহয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে কলকাতায় প্রথম আর্টের ঠাকুর চালু করলেন গোপ্পের পাল কুমোরটুলি সর্বজনীনের ঠাকুর গড়তে গিয়ে। প্রতিমায় মানুষের আদল এল।
সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূজার আঙ্গিক ও সজ্জার বিপুল পরিবর্তন আসে। তবে আঙ্গিকের অভিনবত্বের জোয়ারে দেবীপূজার প্রাচীন মহিমা অনেকাংশেই ক্ষুন্ন হয়েছে। আজ মাটির প্রতিমার স্থানে আখের ছিবড়ে, চায়ের ভাঁড়, দেশলাই কাঠি ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে তৈরী প্রতিমা পূজার পুরানো আবেগ, ঐতিহ্য, মাধুর্য্য ও আন্তরিকতা অনেকটাই ম্লান করেছে সন্দেহ নেই।
শরতের নীল আকাশের নিছে ছায়া - সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি থেকে ঢাকের আওয়াজ, কাশ শিউলির সুগন্ধের পথ বেয়ে দূরদূরান্তরে বয়ে নিয়ে যেতে দেবীর আগমন বার্তা প্রবাসী বাঙ্গালীকে ঘরে ফেরার ডাক দিত। শহরবাসী মানুষ পূজার দিনগুলি গ্রামের শান্ত আঙ্গিনায় ছুটির আড্ডা, পূজা - অঞ্জলি আর থিয়েটার যাত্রার আসরে বসে মুছে নিতেন বৎসরের ক্লান্তি। আজ সময় ও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সে সব অনেকখানি হারিয়ে যাচ্ছে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com